৯

এই তো সেদিনই কোথায়ে যেন একটা পড়ছিলাম, বাঙালীর নাকি ‘শ্রমের’ চেয়ে নাকি ‘বিশ্রামই’ বেশী পছন্দের। আর রোববার বলতেই তো বাঙালী আমজনতা বোঝেন শুধুই বিশ্রাম। আর বিশ্রাম বলতেই কিনা বোঝেন রোববারের সকালবেলাটিতে একটু বেলা অবধি ঘুম। তবে আমার কেন জানিনা, শনিবারের রাত্রে যত রাত করেই শুতে যাওয়া হোক না কেন, রোববারে কিন্তু বেলা অবধি ঘুমোনো হয়নি কোনকালেই। একেবারে কাকডাকা ভোরে না হলেও, রোববারের সকাল সাতটা - সওয়া সাতটার মধ্যেই কিন্তু নিয়ম করে ভেঙ্গে গিয়েছে আমার ঘুম। কৈশোরে বা যুবাবয়সে তো বটেই, এমনকি এইতো কয়েক বছর আগে অবধিও, আমাদের কোপারখয়রানে’র বাড়ীতে, ধারাবাহিক ভাবে রোববারের সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পরেছি পরিবারের সকলের আগে। এবং রবিবাসরীয় সকালের সেই মুহূর্তগুলি পরম বিস্ময়কর আনন্দ ও পরিতৃপ্তির সাথে গুজরান করেছি নিজের একান্ত পছন্দের কিছু গানবাজনা শ্রবণ করে। অনেক রোববারে তো এমনও হয়েছে, যে আমার জীবনসঙ্গিনীটির অমন আরামের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েই শুনতে আরম্ভ করেছি নিজের অভিরুচির কিছু গান। আর সত্যি কথা বলতে কি, সেইসকল রোববারের সকালবেলাগুলির একাকী শ্রবণসুখে একটি অসাধারণ স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়সুখ খুঁজে পেতাম আমি। দাঁতমাজা তো দূরে থাক, চোখেমুখে জলের ঝাঁপটাটুকুও না দিয়ে, রোববারের সকালগুলিতে আমার প্রিয় কিছু রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে পাওয়া যে কি অপরিসীম সুখানুভূতির বিষয়, তা সে প্রত্যক্ষরূপে যারা অভিজ্ঞতা না করতে পেরেছেন, তাঁদের’কে বোধকরি বলেকয়ে বোঝানো যাবেনা।

এখন না হয় আমাদের এই নবীনা আত্মজাদুটির লেখাপড়ার পীড়ন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে...নয়ত ভাবা যায়, অলস রোববারের এক একটি সকালে, আমাদের ওই কোপারখয়রানে’র উপরের ঘরটিতে বিছানায়ে শুয়েবসে, গড়িমসি করতে করতে, একের পর এক শ্রবণ করে চলেছি, সাগর সেন অথবা অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে মনোরম কিছু রবীন্দ্রনাথের গান। চোখে তখনও কিন্তু ভালো রকমের লেগে রয়েছে ঘুম। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোববারের সেই নিস্তব্ধ ও নিরুপদ্রব আধোসকালের সন্ধিক্ষণে শুনতে উপক্রম করেছি সাগর সেনের কণ্ঠে ‘ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা, প্রভু / তোমার পানে / তোমার পানে / তোমার পানে’। অথবা অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘ও যে মানে না মানা / আঁখি ফিরাইলে বলে, না, না, না’। সে সকল রবীন্দ্রনাথের গানের রসগ্রহন, যেন প্রকৃতই এক পরম অপরূপ রবিবাসরীয় প্রভাতানুভূতি। আর কেবলমাত্র সাগর সেন বা অশোকতরুতেই আমাকে নিবৃত্ত করে রাখা চলতনা মোটেই। ঘন্টাখানেক ওই বাসি বিছানায়েই শুয়ে কিমবা খানিকটি আধশোয়া হয়ে বসে, তন্দ্রাতুর অবস্থাতেই ঘড়িতে আটটা – সাড়ে আটটা বাজা পর্যন্ত একেএকে নিয়ম করে শ্রবণ করে নিতাম আমার সবকটি প্রিয় শিল্পীর রবীন্দ্রসঙ্গীত।

আমার প্রিয় শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই পড়তেন সুমিত্রা সেন ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। আর তারপরেই শ্রীকান্ত আচার্য এবং অবশ্যই দেবব্রত বিশ্বাস। রোববারের ঘড়িতে সাড়ে আটটা ন’টা বেজে গেলেও বা সকালের রোদ চড়া হয়ে উঠে গেলেও কিন্তু শেষ হয়ে যেতনা আমার রোববারের রাবিন্দ্রীক সঙ্গীতাসর। বরং এমনও হয়েছে যে আমার জীবনসঙ্গিনীটিকে একপ্রকার জ্বালাতন করে ও খুঁচিয়েই ঘুম থেকে তুলে দিয়ে শুনিয়ে ছেড়েছি সমসাময়িক দিনের কিছু নতুন শিল্পীদের রবীন্দ্রসঙ্গীত। পাঁচ সাত বছর আগের হালফিলের শিল্পীদের মধ্যে শুনে নিতে হত মনোময় ভট্টাচার্য, সুপ্রতীক দাস, অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবশ্যই শ্রাবণী সেনের গান। বাঙালীর রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে যে চিরকালীন জবজবে আবেগটি রয়েছে, সেই আবেগেই আমি ও আমার জীবনসঙ্গিনীটি তখন সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত হয়ে থাকতাম সেইসব রোববারের সকালগুলিতে। তারপর কেবলমাত্র শ্রবণই নয়, কিছু বাছাই করা জনপ্রিয় গোছের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে মিলিয়েও দিতাম আমার নিজের যত্নহীন কণ্ঠটি। ওই যেমন আগেই বলেছি তার গল্প। আমার লঘু নকলনবিশি স্বভাবের পশ্চাদ্ধাবন করে, কিছু পরিচিত রবীন্দ্রনাথের গানে, গলাটিকে হয়ত একটু প্রয়োজনের চেয়ে অধিকমাত্রায়ে সুললিত করে, সামান্য ‘ব্যারিটোন’

ব্যাপারটিকে এনে ফেলে, অবিকল মনোময়ের মতন গেয়ে উঠলাম 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি / তোমায়ে দেখতে আমি পাইনি... বাহির পানে চোখ মেলেছি / আমার হৃদয় পানে চাইনি'।

তবে এসমস্ত রবীন্দ্রনাথের গান শোনার ও গেয়ে ওঠার গল্প নেহাতই কিন্তু অতীতের। বর্তমান দিনে এমন একটিও রোববার পেয়েছি বলে তো মনে আসছেনা এই মুহূর্তে। তবে এটি খুব মনে পড়ছে যে, আমাদের পুণের পাট তুলে দিয়ে নবী মুম্বইয়ে স্থানান্তরিত হওয়ার পর, কোপারখয়রানে'র বাড়ীতে উঠে এসেই এসমস্ত রবিবাসরীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করা হত খুব বেশী করে। সে হবে গিয়ে ২০০৫ / ২০০৬ সালের গল্প। তবে এখন তো আবার বাসা গিয়েছে বদলে। কোপারখয়রানে থেকে আমরা উঠে এসেছি ঘনশোলী নামক নবী মুম্বইয়েরই একটি ভিন্ন পাড়ায়ে। আর শুধু পাড়াই ভিন্ন হয়নি, কেন জানিনা মনে হয়, আমি নিজেও এই বছর সাতেকে একটু কেমন যেন ভিন্নই হয়ে পড়েছি অতীতের নিরিখে। বয়েসটিও যেন না বলেকয়ে একধাপে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে বলেই মনে হয়। তাই এখন মাঝবয়েসের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে নিজেকে কেন জানিনা সমস্ত বিষয়েই কেমন তুচ্ছ ও জ্ঞানরহিত বলে মনে হয়। তাই তো মনোময়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে গিয়ে, তার সাথে আর নিজের সাধের কণ্ঠটি মিলিয়ে দেওয়ার অনুপ্রেরণা আর পাইনা। বরং কবিগুরু যা কিছু নিজের গানগুলিতে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, সেটিই চলিত নিয়মে ও মাঝবয়সের ধর্ম মেনেই সম্পাদন করার প্রয়াস করি মাত্র। অতঃপর বাহির পানে চোখ না মেলে, এই মধ্যবয়েসে বোধহয় একটু হৃদয় পানে চেয়েই অতীতের রোমন্থন করছি অধিকতর।

অতীত বলতে, এই তো মাত্র পাঁচ সাত বছর আগে অবধিও, আমার অমন সখের রবীন্দ্রনাথের গান কেমন করে শোনা হত, সে কথা ভেবেই বোধহয় হারানো দিনগুলি ফিরে পাবার আকাঙ্খা হয় আরও বেশী। এখন তো ইন্টারনেট, গুগল, ফেসবুক আর স্মার্টফোনের জামানায়ে বসবাস করে আমরা সকলেই কেমন অত্যধিক মাত্রায়ে প্রযুক্তিবাদী হয়ে পড়েছি বলে মনে হয়। বছর সাতেক আগে অবধিও, আমাদের কোপারখয়রানে'র বাড়ীতে, শনিবারের রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে কেমন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের অডিও কমপ্যাক্ট ডিস্কগুলি খুঁজে, বেছে ও ঝেড়েপুঁছে রেখে দিত হত আমাকে। পরদিন ঘুম ভাঙ্গানিয়া রোববারের সকাল সকাল শ্রবন করার জন্যে। আর এখন তো কমপ্যাক্ট ডিস্ক কেন, গান ডাউনলোড করেও রাখতে হয়না বলেই শুনছি। সরাসরি ওয়াই-ফাই মারফত চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের চেনা রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনও একটি ডট-কম ওয়েবসাইট থেকে অবিলম্বে স্ট্রিমিং হতে থাকবে একটি ব্লুটুথ যুক্ত 'বোস' কোম্পানীর সাউন্ড স্পিকারে। অবাক করে দিয়ে যুগ ব্যাপারটি যে কিভাবে অতিরিক্ত মাত্রায় অগ্রসর হয়ে পড়ছে, তার সাথে আমার মতন প্রযুক্তিবিদ্যাহীন নির্লিপ্ত মানুষের সামঞ্জস্যবিধান করা চলা বোধহয় বেশ কঠিন কাজ।

তাই তো এই প্রযুক্তির বাজারে, রোববারগুলির সকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর শুনিনা আজকাল। গত দুই কি তিন বছরে বারদুয়েক শুনেছি বলেও তো স্মরণে আসছেনা। আজকাল রোববারের সকালগুলিতে সকাল সকাল ঘুম ভেঙ্গে গেলে, নিজের স্মার্টফোনে ই-মেইল বা মেসেজগুলি পড়ে নিয়েই, জানালার পর্দাটি সামান্য সরিয়ে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। চরম স্বার্থপর ও আত্মপ্রেমীর মতন নিজেকে নিয়েই ভাবনাচিন্তা করি খুব। অন্তর্দর্শনেই ও হৃদয় পানে চেয়ে, বুঝি নিজের শৈশব, কৈশোর বা যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন করতেই মন দিয়েছি বেশী করে। শুধু তাই নয়, নিজের চরিত্রের আর পাঁচটি জিনিস নিয়েও বেশ গুরুতর বিচার বিবেচনাও করছি আজকাল। নিজের চারিত্রিক শক্তিমত্তা কিসে যে বেশী, আর কিসেই বা কম, এই নিয়েই তো সাতকাহন ভেবে ফেললাম গত রোববারের সকাল সকাল। এবং ওই সকালের মাত্র পৌনে ঘন্টার মধ্যে, মেঘলা ছাই রঙের আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে, বুঝে ফেলা হয়ে গিয়েছে যে আমার চারিত্রিক শক্তির চেয়ে শক্তিহীনতাই বুঝি বেশী এবং ক্ষমতার চেয়ে অক্ষমতা। খুব মনে পড়ছিল, ছেলেবেলায়ে আমাদের ইশকুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই ভট্টাচার্য স্যার বলেছিলেন, "অনির্বাণ... ইস্পাত কিন্তু থাকলেই হয়না, তাতে রোজ ধার দিতে হয়..."। আমার বাবাও কেন জানিনা এই কথাটি বারংবার মনে করিয়ে দিতেন আমার কৈশোরে। ওই ধার জিনিসটিই আমার ইস্পাতে কোনকালে দিইনি বলে, সেই রোববারের সকালে, আমি

একরকম নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই বুঝে ফেলেছিলাম যে, যতই করিতকর্মা ধরণের সমকালীন বুকনি ঝাড়িনা কেন, আমি কিন্তু রয়ে গেছি ধারবিহীন ইস্পাত, আদপে অন্তঃসারশূণ্য ও নিতান্ত সাধারণ একটি তার্কিক বাঙালী। যতই অফিসকাছারিতে, বন্ধুবান্ধব ও চেনা-অচেনা প্রতিবেশীদের সামনে চাতুর্যপূর্ণ ওস্তাদি প্রকট করি না কেন, ধার না দেওয়ার কারণেই, মগজটি কিন্তু এখনও বেশ অজ্ঞ ও একেবারেই আনাড়ী।

এই যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথাই ধরা যাক না কেন। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক বাঙালীর চেয়ে বেশীমাত্রায়ে শ্রবন করলেও, বা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, উপন্যাস বা কবিতাগুলি অনেকের তুলনায় বেশী করে আমার পড়া থাকলেও, কোনও রাবিন্দ্রীক বিষয়েই কিন্তু বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান আমার হয়ে ওঠেনি আজও। আর কেবল রবীন্দ্রনাথকেই বা দোষ দেব কেন, এই মাঝবয়েসে পৌঁছে এখন বেশ ভালরকমেরই অনুভব করতে পারি যে বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান আমার কোন বিষয়েই নেই। সে রবীন্দ্রনাথের গানই হোক বা সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা, নরেন্দ্র মোদীর জাতীয় রাজনীতিই হোক বা ক্রিকেট-ফুটবলের খবরাখবর। সব ব্যাপারগুলিই আমার কাছে কেমন যেন ধারবিহীন ও ভাসা ভাসা। উপযুক্ত গভীরতা নেই কোনও বিষয়েই। সব কটি বিষয়েই কিছুটা নির্দিষ্ট পরিসরে ও প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ওয়াকিবহাল থাকলেও, যথার্থ জ্ঞান নামক বস্তুটি কিন্তু কেমন যেন মনে হয় বড্ড উপর-উপর ও নিতান্তই অনুপযুক্ত। অতি সাধারণ ও চলতি ধরণের বিদ্যাবত্তা হয়ত বিষয়গুলিতে কিছু আছে। সকল বিষয়গুলিই হয়ত পত্র-পত্রিকায়, টেলিভিশনে বা রোজকার বাড়ী-অফিসের আলাপ আলোচনায়ে পর্যবেক্ষণ করে চলেছি প্রতিনিয়ত, কিন্তু ধারবিহীন ইস্পাত বলেই কিনা জানিনা, তাতে বিশেষজ্ঞসুলভ স্বীয় পরিজ্ঞানের অভাব বড় বেশী বোধ করি ইদানীংকালে।

রোববারের সকালে ছাই রঙের আকাশের পানে চেয়ে, এই প্রকারের লজ্জাজনক বোধদয় হওয়া সত্ত্বেও, একেবারে খাঁটি প্রতীকস্বরুপ বঙ্গসন্তানের মতন, সর্বস্থানে, সর্বঘটে কাঁঠালি কলার মতন, সকল আলোচ্য বিষয়গুলিতেই অংশগ্রহণ করে কিছু না কিছু তাৎপর্যমুলক ব্যাখ্যা করা চাইই চাই আমার। কফি পান করতে করতে অফিসের স্মোকিং রুমে হয়ত অজিঙ্ক্যা রাহানের ধ্রুপদী ব্যাটিং দক্ষতা বা লিওনেল মেসির ড্রিবলিং ক্ষমতা বর্ণনা করে ছোটখাটো একটি অকারণ বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম বা সন্ধ্যেবেলায়ে বাড়ীতে ফিরেই কঙ্গনা রানাওয়াত বা দীপিকা পাড়ুকোনের অভিনয়ের পটুতা নিয়ে বড়কন্যাটির সাথে করে ফেললাম একটু নিষ্প্রয়োজন তর্কাতর্কি। আবার কোন কোনোদিন হয়ত রাজ্য বনাম কেন্দ্রের রাজনীতিতে দিদির সাথে মোদী সাহেবের বা মহেন্দ্র ধোনির সাথে বিরাট কোহলির সমন্বয়সাধন কি ভাবে হওয়া সম্ভব, সেই নিয়ে রাতের দিকে একটি নাতিদীর্ঘ ও সযত্ন ভাষণ দিয়ে, বাবাকে একটু বিনা দরকারেই চাগিয়ে দিয়ে গেলাম শুতে। অথবা হঠাৎ কোনও এক পরিচিত প্রতিবেশীকে ব্রাজিলের ফুটবলের ঘোর দুর্দিন নিয়ে অনাবশ্যক শিক্ষাপ্রদান করে বসলাম। আবার এই তো সেদিন 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকায়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরামন রাজন সাহেবের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার মনোযোগ দিয়ে পড়েই, নিজের মনে মনেই ঠিক করে ফেললাম, এইবার অফিসের স্মোকিং রুমে বা আমাদের বহুতল বাড়ীটির প্রতিবেশীকুলে বা বন্ধুমহলে রাজন সাহেবের বা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কোনও প্রসঙ্গ উঠলেই, বিলম্ব না করে, দিয়ে ফেলব আমার সুচিন্তিত কিছু প্রাসঙ্গিক মতামত।

কি অদ্ভুত হাস্যকর ও সস্তা মানসিকতা। ভুলেই যাই মাঝে মধ্যে, যে এখন আমি সেই বাইশ-তেইশ বছরের খোকাটি আর নেই। বেশ বড়ই হয়ে গিয়েছি। শুধু বড় কেন, বুড়োই হয়ে গিয়েছি বলা চলে। গোঁফ ও দাঁড়ি তো পেকে গিয়েছেই, ঝুলপিতেও ধরেছে বেশ রূপোলী একটি বয়সোচিত আভা। এই পক্কদাঁড়ি ও পক্কঝুলপি নিয়ে, এই প্রকারের কোনও অনাবশ্যক চর্চা করলে, আজকাল বেশ বুঝে উঠতে পারি যে সব বিষয়েই আমার অনলস বক্তব্যগুলি বয়সানুপাতে হয়ে যায় বড় অগোছালো। ওই আগেই বলেছি না, আমি একটি ধারবিহীন ইস্পাত। সমগ্র বিষয়গুলিতে ব্যবহারিক গোছের একটা মোটামুটি অবগতি থাকলেও, প্রজ্ঞা ব্যাপারটি কিন্তু একেবারেই অগভীর ও কিছু জায়গায়ে তো দেখেছি পুরোপুরি রূপে অনুপস্থিত। যথাযথ লেখাপড়া ছাড়াই, যখন কোনও বিষয় নিয়ে ঈষত

আলাপচারিতা করতে বসি, তা করি কিন্তু প্রজ্ঞা থেকে একেবারেই নয়, সম্পূর্ণ মাঝ-বয়েসের পরিপক্কতা থেকে। এবং উপযুক্ত ও যথোচিত প্রবোধ ছাড়াই। আর যত দিন যাচ্ছে, আরও বেশী করে উপলব্ধি করতে পারছি আমার ধারবিহীন ইস্পাতের মধ্যে সম্যক জ্ঞানসম্পন্নতার অভাব ও অগভীর অবগতির বিষয়টি। এর কারণও খুঁজেছি গত রোববার। এবং ওই পৌনে ঘন্টার ভাবনাচিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছিয়েছি ও একরকমের নিশ্চিতই হতে পেরেছি, যে আমার চরিত্রের মধ্যে স্বাভাবিক উদ্যম, সমুচিত যত্নশীলতা ও উপযুক্ত অধ্যবসায়ের বড়ই বেশী অভাব। আমার বুঝতে বুঝতে এই চুয়াল্লিশ বছর লেগে গেলেও ভট্টাচার্য স্যার কিন্তু আমাকে ওই পনের বছর বয়েসেই ওই উপদেশখানি দিয়ে দিয়েছিলেন। অভিজ্ঞ অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের ছাত্রটিকে দেখেই উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয়নি কিছুমাত্র।

যেমন এই আমার গান গাওয়ার বিষয়টিই ধরা যাকনা কেন। শৈশবে মা একরকমের জোর-জবরদস্তি করেই আমাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন ঢাকুরিয়া পাড়ার একটি গানের ইশকুলে। একইসঙ্গে আমার মায়ের ও জেঠিমার বন্ধুস্থানীয়া ছন্দা সেনগুপ্ত নাম্নী এক রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিদিমনির কাছে। সে তখন হবে গিয়ে ১৯৭৮ বা ১৯৭৯ সাল। ঢাকুরিয়ায়ে আমার জ্যাঠামশাইয়ের ৬৭বি মহারাজ টেগোর রোডের বাড়ীতেই রোববার সন্ধ্যেবেলা করে বসত সেই গানের ইশকুলটি। আমার জ্যাঠামশাই ভদ্রলোক আদপে বেশ কড়া মেজাজের মানুষ হলেও, গানের ইশকুল হয়েছে শুনতে পেয়ে, বেশ খুশি মনেই একটি অনাড়ম্বর হারমোনিয়াম কিনেও এনেছিলেন আমার জ্যাঠতুতো দিদিটির জন্যে। খুব ভালোমতন মনে পড়ছে, প্রথম সেই গানের ইশকুলের সন্ধ্যেবেলাটির কথা। জ্যাঠার বাড়ীর সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাসে যাওয়ার আগে, আমার বার্নপুরের চিনিকাকার দেওয়া ছিটছিট নক্সার নীল রঙের একটি মোটা ও কাপড়ের বাঁধাই করা একটি খাতার উপরে আমার বাবা সুন্দর করে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিয়েছিলেন, 'অনির্বাণ দাশগুপ্ত – গানের খাতা'। একমাত্র পুত্রের (তখনও আমি একমাত্রই ছিলাম কিনা) রবীন্দ্রসঙ্গীতের জীবনে পদার্পণ ও শুভারম্ভ বলে কথা। আমার মা তো বটেই, আমার বেরসিক স্বভাবের বাবাও বেশ গর্বই বোধ করেছিলেন ছেলের গান শিখতে যাওয়ায়ে। তবে সেদিনের ওই রোববারের সন্ধ্যেবেলায়ে খুব স্পষ্ট ভাবেই মনে পড়ছে যে, ছন্দামাসির কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শেখার চেয়ে, আমার কাছে চিনিকাকার দেওয়া ওই নীল নক্সার গানের খাতাটি কৌতূহলোদ্দীপক ছিল অনেক মাত্রায়ে বেশী। তদ্ব্যতীত, ওই নীল খাতাটির পৃষ্ঠাগুলি যতদুর মনে পড়ছে, ছিল সাদা। আমাদের অভ্যাসগত রুলটানা নয়। মায়ের হাত ধরে সন্ধ্যেবেলায়ে ঢাকুরিয়ার অলিগলি হয়ে জ্যাঠার বাড়ীতে যাওয়ার সময়ে, সেই সাদা রুলবিহীন গানের খাতায়ে আমি ঠিক কিপ্রকারে ছন্দামাসির দেওয়া সঙ্গীতসংক্রান্ত নির্দেশ বা রবীন্দ্রসঙ্গীতটি টুকে নেব, সে বিষয়ে ছিল একটি চাপা উত্তেজনা।

সেই রোববারের সন্ধ্যেবেলা, খুব মনে পড়ছে আমার, সর্বপ্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতটি আমাদের ছন্দামাসি শিখিয়েছিলেন, "ফাগুন হাওয়ায়ে হাওয়ায়ে করেছি যে দান..."। এবং শুধু তাই নয়, প্রথম গানের ইশকুলের রোববারের সন্ধ্যেবেলাটিতে আমার জ্যাঠতুতো দিদিসমেত আরও গোটা সাতেক কিঞ্চিত অবোধ বালিকার সামনে গান শিখতে বসে আমার বেশ জবুথবু ও ভালরকমের অপ্রতিভ লেগেছিল বলেই মনে পড়ছে। ভাবা যায়, সাতটি ছাত্রীর সাথে কেবলমাত্র আমি একা ছাত্রটি। যেন 'সাত বোন পারুল আর এক ভাই চম্পা'। এছাড়া এ স্মৃতিও ভুলে যাওয়ার নয়, যে বেঢপ মাপের একটি ঢিলেমার্কা হাফপ্যান্ট পড়ে, পাটপাট করা তৈলাক্ত চুলে বাঁদিকে সিঁথিকাটা একটি উঁচকপালি ও গালফুলো ভাই চম্পাকে দেখে দিদির বুদ্ধিমতী বান্ধবীসকল বেশ তামাশাই করেছিল। আর তাতে যে আমি বেশ ভীষণরকমই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম, তাও মনে আছে বেশ। তবে সে সমস্ত চম্পা পারুলের মশকরা কিন্তু হয়েছিল আসল গানটি শুরু হওয়ার আগে। ছন্দামাসি তখনও তাঁর একমাত্র ছাত্রটিকে খুব একটা আলাদা করে গুরুত্ব না দিয়ে, বরং ছাত্রীদেরকেই বেশী করে ধাধিনা নাতিনা'র দাদরা তাল ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃতি পর্যায় ব্যাখ্যা করতে ব্যাস্ত ছিলেন। তারপরে ছন্দামাসি স্বয়ং ফাগুন হাওয়ায়ে হাওয়ায়ে গেয়ে গেয়ে, গানটি এক ঘন্টার মধ্যেই সকলকে তুলিয়ে ছেড়েছিলেন। সেই আমার প্রথম বিধিসম্মত রূপে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া। ছন্দামাসির থেকে জীবনে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত রীত্যনুসারে গেয়ে আমার এক

অকৃত্রিম চিত্তপ্রসাদ ও দম্ভ জন্মেছিল। তবে একইসঙ্গে এও বেশ মনে পড়ছে, যে আমার গানের গলাটি শুনেই কিনা জানিনা, ছন্দামাসি সমস্বরে গাওয়া গানটি শেষে, চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে, আমাকে একাকী ফাগুন হাওয়ায়ে হাওয়ায়ে গেয়ে শোনাতে নির্দেশ করেছিলেন। হয়ত একটি সুযোগই দিয়েছিলেন বলা চলে, ওই পারুল বোনগুলিকে একটু সমুচিত কিছু জবাব শুনিয়ে দেওয়ার। খুব ভালরকমের মন ঢেলে ও চোখ বুজিয়ে, সকলের সামনে খালি গলায়ে খুব আন্তরিক ভাবেই গেয়ে দিয়েছিলাম রবীন্দ্রসঙ্গীতটি। এবং এখনও আমার স্মৃতিতে বেশ ভালরকমের গেঁথে রয়েছে, যে গানটির অন্তরায়ে "তোমার অশোকে কিংশুকে, অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে", সঞ্চারীতে একটু উঁচু মাত্রায়ে 'তোমার প্রজাপতির পাখা, আমার আকাশ চাওয়া মুগ্ধ চোখের রঙিন স্বপন মাখা' ও শেষের পঙক্তির "চাঁদের আলোয়ে..." দেওয়া টানগুলি আমার নবমুকুলিত কচি গলায়ে শুনে, ছন্দামাসির সঙ্গে ওই বালিকাদিগের টনকটুকুও যে নড়ে গিয়েছিল সে নিয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই। শুধু আমার ফোলা গালদুটি টিপে, আমার মা'কে ছন্দামাসি বোধহয় একটু রসিকতা করেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কিরে? ছেলেকে গায়ক বানাবি নাকি?"

সেদিনের ফাগুন হাওয়ায়ে হাওয়ায়ে এর ক্ষণস্থায়ী সাফল্যের পরে এবং অমন একটি বালিকা পরিবৃত বেয়াড়া ও সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে আচমকা একটি বিজয়সূচক ব্যাপার ঘটিয়ে, আমি তো একরকমের স্থিরই করে ফেলেছিলাম গায়কই হতে হবে আমাকে বড় হয়ে। তারপরের কয়েকটি মাস অতিবাহিত করেছিলাম ছন্দামাসির কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করে। 'ফাগুন, হাওয়ায়ে হাওয়ায়ে' টি ভালো করে তুলে নিয়েই, তার পরেই 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা', 'আকাশ জুড়ে শুনিনু...', 'খোল খোল দ্বার...রাখিয়োনা আর...' বা 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ' জাতীয় গোটা দশেক রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলে নিয়েছিলাম আমি। আর ওই সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত তখন আমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়ীতে লোকজন কেউ এলেই মা একথা ওকথায়ে তাঁদেরকে শুনিয়ে দিতে বলতেন। আর অবিলম্বে প্রশংসাও পেয়ে যেতাম আমি। আর তখন থেকেই সেই প্রশংসা পেয়ে পেয়েই আমার হয়েছিল গায়ক হওয়ার চরম শখ। কিন্তু শখ ষোলোআনা থাকলেও, উপযুক্ত অধ্যবসায়ের অভাবে ও আমার চরম পরিশ্রমবিমুখতার জন্যেই, ওই গোটা দশেক ছন্দামাসির শেখানো রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কোনও গানের কথাগুলি ভালো করে মুখস্থও করে উঠিনি কোনকালে। বাড়ীতে গীতবিতান, স্বরবিতান বা রবীন্দ্র রচনাবলী থাকলেও, গানের পর্যায় ও তালের রকমফের বুঝিনি কোনদিনই। এমনকি জ্যাঠার বাড়ীতে একটি জলজ্যান্ত হারমোনিয়াম পড়ে থাকা সত্ত্বেও, বাজানো শেখার ইচ্ছেই হয়নি কোনদিন। অধ্যবসায়ী পারুল বোনেরা তাঁদের রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা ছন্দামাসির কাছে বজায় রাখলেও, এই অধম ওই ধারবিহীন ইস্পাতটি কিন্তু রোববারের গানের ইশকুলে গিয়েছিল মাত্র মাস পাঁচেক কি ছয়েক। ওই যে আগেই বলেছিনা, স্বাভাবিক উদ্যম, সমুচিত যত্নশীলতা ও উপযুক্ত অধ্যবসায়ের ছিল বড়ই বেশী অভাব।

সেই ১৯৭৮'এর পরে গান আর কোনদিনই কোনও মাস্টারমশাই বা দিদিমনির কাছে শিখিনি। পরবর্তী কালে ১৯৮৫ সাল নাগাদ প্রভাতকুমার ভঞ্জ নামের এক মাঝারিমানের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষককে আমাকে গান শেখানোর জন্যে আমার মা রাজি করাতে পারলেও, আমাকে কিন্তু রাজি করিয়ে উঠতে পারেননি। খুব মনে পড়ছে, শ্বেতশুভ্র ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত ও ক্রমাগত পান চিবোনো প্রভাতবাবু ভদ্রলোকটি বিকেলের দিকে বারদুয়েক এসে ফিরেও গিয়েছিলেন আমাকে বাড়ীতে না পেয়ে। ফুটবল ক্রিকেট খেলা ছেড়ে বা বৈকালিক আড্ডা না মেরে, বাড়ীতে খাটে বসে বসে প্যাঁপ্যাঁ করে ন্যাকাবোকা বিনুনি বাঁধা মেয়েদের মতন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখব, সে ব্যাপারটি ভাবতেই কেন জানিনা আমি সহজেই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম আমি। মনে হয়েছিল, গান আবার পয়সা খরচ করে শিখতে হবে নাকি? ও তো একদুইবার মন দিয়ে শুনে নিলেই হল। গান বলতেই তখন আমার কাছে কেবলমাত্র একবার দুইবার কানে শুনেই সুরেসুরে গলা মিলিয়ে দেওয়া। প্রচলিত প্রথানুযায়ী বা আনুষ্ঠানিক রূপে গান না শিখলেও, গায়ক হওয়ার স্বপ্ন কিন্তু তখনও ছিল। বাড়ীতে মা বাবার অলক্ষ্যে সুর ভেঁজে যেতাম সারাদিনই। আর একাকী শুয়েবসে সুর ভাঁজতে গেলেই, একটি খবরের কাগজ বা কোনও একটি বঙ্গলিপি খাতা গোল করে পাকিয়ে নিয়ে মুখের সামনের মাইক্রোফোন

বানিয়ে নিতাম। সর্বক্ষন ধরে চলত, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমার গানের চর্চা ও গায়ক হওয়ার অনুশীলন। এবং গান গাইতে গাইতেই, ঠোঁট দুটি ঈষৎ সরু ও প্রসারিত করে, জিভ দিয়ে এমন একটি বিশেষ শোঁশোঁ ধরণের ধ্বনি নির্গত করতাম, যাতে করে কিনা মনে হত, আমার সামনে বসে রয়েছেন অগনিত শ্রোতাবন্ধুরা। আর সেই সব অদৃশ্য শ্রোতাসকল আমার গাওয়া গান শুনে খুব উচ্চরবে তারিফ করছেন আর মানুষের করতালিতে ফেটে পড়ছে সারা হল।

তবে কেবলমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতই নয়। মায়ের গাওয়া শুনেই শিখে নিয়েছিলাম দু একটি অতুলপ্রসাদী, শ্যামাসঙ্গীত, সলিল চৌধুরীর সুরে লতা মঙ্গেশকরের বা আশা ভোঁসলের গাওয়া জনপ্রিয় কিছু পুজার গান। খুব মনে পড়ছে, পিতৃবন্ধু অরুনকাকা তবলা বাজাতেন রাধাকান্ত নন্দী'র আখড়ায়ে। সেই অরুনকাকা একটি স্টেনলেস ষ্টীলের বাটিতে ঠেকা দিচ্ছেন আর আমি চোখ বন্ধ করে গেয়ে চলেছি মান্না দে'র পুজার গান, "সে আমার ছোট বোন... বড় আদরের ছোট বোন..."। সেই সেইবার পুজার সময়ে বাবার অফিসের বন্ধুদের সাথে দীঘা নয়ত হাজারিবাগে বেড়াতে গিয়ে অরুনকাকার থেকে একবার শুনেই তুলে নিয়েছিলাম মান্না দে'র ওই বিখ্যাত গানখানি। পুজার সময়ের কথায়ে মনে পড়ল, তখনকার দিনে ওই সত্তরের দশকের বা আশির দশকের গোড়ায়ে, কথায়ে কথায়ে পাড়ায়ে পুজা হতেই থাকত কিছু না কিছু। আর যে কোনও পুজা মানেই আমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়ীর সামনে, মহারাজ ঠাকুর রোডের মোড়ের মাথায়ে বান্ধব সম্মিলনী বা তরুন মহল জাতীয় কিছু স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে, প্রাংশু কিছু চোঙ্গা ধরণের মাইক লাগিয়ে দিয়ে যেতেন। (সেই চোঙ্গাগুলি আদপে লাউডস্পীকার হলেও, তখনকার আমলে ওগুলি 'মাইক' নামেই পরিচিতি পেত)। দুর্গা পুজার জন্যে দিনপাঁচেক কি দিনসাতেক তো ধরা থাকতোই, এছাড়াও ছিল সরস্বতী পুজা, জগদ্ধাত্রী পুজা, ঝুলন বা রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, বিশ্বকর্মা পুজা প্রভৃতি। যে কোন পুজা মানেই তো মাইক বাজানো তো লেগেই থাকত অষ্টপ্রহর। (তাও তো এখন ভালরকম বুঝতে পারি যে, আমাদের ঢাকুরিয়া পাড়াটি ছিল যথেষ্ট সুসভ্য ও মার্জিত। উত্তর বা মধ্য কলকাতায়ে বা বালিগঞ্জের সমীপবর্তী গরচা সেকেন্ড লেনে এমনও দৃশ্য দেখেছি আমি, কোনও মহাপুরুষের জন্মতিথিতে, একটি কাঠের বেঞ্চিতে বা ইটের বেদীতে মহাপুরুষের একটি ছবিতে রজনীগন্ধা বা গাঁদাফুলের একটি মালা চড়িয়ে কিছু জনপ্রিয় ঢিনচ্যাক গোছের হিন্দি গান উচ্চৈঃস্বরে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে)। আমাদের ঢাকুরিয়া পাড়াতেও সে সমস্ত পুজায়ে, ওই চোঙ্গ মার্কা প্রাংশু মাইকে বেজে চলত একের পর এক তৎকালীন হিন্দি ছবির গান। আমাদের বাড়ীতে কিন্তু হিন্দি গানের চর্চা একেবারে না থাকলেও, সেই মাইক বাজানো শুনেই, ছন্দামাসির কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, মায়ের কাছে অতুলপ্রসাদী ও শ্যামল মিত্র বা অরুনকাকার কাছে মান্না দে'র গানের বেড়া ডিঙ্গিয়ে, খুব সহজেই, হিন্দি ছবির গানও তুলে নিতে শিখে নিয়েছিলাম আমি।

আর ডি বর্মণ, কিশোর কুমার, মহম্মদ রফি, মুকেশ বা অন্য অনেক গায়ক / নায়কদের নাম ওই ছেলেবেলায়ে অতশত না বুঝতে পারলেও, 'অমর আকবর অ্যান্টনি, 'ত্রিশুল', 'মুকাদ্দার কা সিকান্দার' বা 'ডন' ধরণের অমিতাভ বচ্চনের সুপারহিট ছবির গানগুলি মা'য়ের অজান্তেই গুনগুন করে গেয়ে নিতাম আমি। এবং খুব মনে পড়ছে, এবং মনে পড়ে সামান্য হাসিও পেয়ে যাচ্ছে, পাড়ার মাইকে শুনে 'সরগম' ছবির একটি গান আমাদের সেন্ট লরেন্স স্কুলের দ্বিতীয় ট্রিপের বাসে করে ইশকুল থেকে বাড়ী ফেরার সময়ে গুনগুন করে গেয়ে যেতাম অবিরত। যতদুর মনে পড়ে গানটি ছিল 'রাম জি কি নিকলি সওয়ারি' নামে একটি মহম্মদ রফির সাহেবের গান। দু এক লাইন গাইবার পড়ে, গানটির পদগুলি সঠিক ভাবে না মুখস্থ থাকবার ফলে, নিজের মনে মনেই বানিয়ে নিয়েছিলাম বাকি গানখানি। সে উপহাসাস্পদ নিজস্ব লাইনগুলি এখনও আমার মনে আছে যথাবৎ। এছাড়াও তৎকালীন হিন্দি গানের ভিতরে খুব মনে পড়ে, 'সত্যম শিবম সুন্দরম' ছবির 'যশোমতী মাইয়া সে বোলে নন্দলালা...' গানটি। ওই গানটি তো আমার মা নিজেই আমাকে দুএকটি বার গেয়ে শুনিয়েছিলেন। গানটি অবশ্য ছিল তৎকালীন হিন্দি গানসমূহের মধ্যে, আমার মায়ের অন্যতম প্রিয় গান। এছাড়াও 'ম্যায় হু ডন...' বা 'খাইকে পান বানারসওয়ালা'... অথবা, 'হোনি কো আনহোনি করকে, আনহোনি কো হোনি...' হয়ে উঠেছিল আমার বেশ প্রিয়। পরবর্তী কালে আমার 'বন্ধু'র কাছে তাঁর

সখের এইচএমভি'র রেকর্ড প্লেয়ারে আশির দশকের পাকিস্তানী পপস্টার নাজিয়া হাসান, জোহেব হাসান ও বিড্ডুর 'ডিস্কো দীওয়ানে... আহা আহা...' শুনে আমার চুলখাড়া হয়ে গিয়েছিলো বলেই মনে পড়ছে। আরও পরে, মুম্বই কাঁপানো দুই বঙ্গসন্তান বাপ্পিদা ও মিঠুনদার যুগলবন্দীতে 'ডিস্কো ড্যান্সার', 'ড্যান্স – ড্যান্স' বা 'কসম পয়দা করনে ওয়ালে কি' আমার বয়ঃসন্ধিকালের কাঁচা মনে এক গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল। তারও পরে 'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া', 'কয়ামত সে কয়ামত তক', 'শরাবী', 'লাওয়ারিশ বা 'এক দুজে কে লিয়ে' ছবির গানগুলিও পুজা প্যান্ডেলে শুনে শুনেই খুব ভালো করে তুলে নিতে পেরেছিলাম আমি। হোপ '৮৬ এর সময়ে তো আমরা তখন বালিগঞ্জে। সংস্কৃতিমনস্ক বামপন্থীদের মুখে ছাই দিয়ে স্বয়ং জ্যোতিবাবু নিজে শীতের সন্ধ্যেবেলা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বসে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে শুনেছিলেন ঊষা উত্থুপের কণ্ঠে 'রাম্বা হো...'।

তখন ঢাকুরিয়া ছেড়ে আমি বালিগঞ্জের অলকাপুরী নামক বহুতল বাড়ীটিতে এসে, আমার ছেলেবেলার বন্ধু শুভ্রশেখরের পাল্লায়ে পড়ে গিয়ে সাপের পাঁচ পা'ই দেখে নিয়েছিলাম বুঝি। কথায়ে কথায়ে, উদিত নারায়ণের গলায়ে 'পাপা কহতে হ্যাঁয়' বা অবিকল কিশোর কুমারের মতন করে 'দে দে পেয়ার দে' গেয়ে দিচ্ছি। আমাদের বাড়ীরই আটতলায়ে সরকার জেঠীমাদের ঘরে সকাল সন্ধ্যে ঘনঘন ভিসিআর চালিয়ে, সপ্তাহে প্রায় দিন চারেক করে দেখে নিচ্ছি 'শরাবী'। বেশ লায়েকই হয়ে উঠেছিলাম বলা চলে। এবং তখন আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শুভ্রশেখর, কৌশিক, বিবি, মুন্নি, মৌসুমি, মিতা, মৌ, টিঙ্কু, সুমিত, লাল্টু, রাজু, সান্টু ও পড়াশুনোয়ে মেধাবী অভিরূপদের সাথে মেলামেশা করে, তাঁদের আমার গলায়ে গান শুনিয়ে, আমার পুরোদস্তুর গায়ক হওয়ার অভিলাষ তখন একেবারে তুঙ্গে।

(খুব সম্ভবত) আমার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরে পরেই (চরম ফাঁকিবাজিতে, ততদিনে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায়ে গাড্ডু পাওয়া হয়ে গিয়েছে ও ঠাকুরপকুর ক্যান্সার হাসপাতালের উপকণ্ঠে নৈমিত্তক রবিবাসরীয় প্রভাতী যাতায়াত শুরু হয়ে গিয়েছে), আশির দশকের শেষদিকে 'রাম-লখন', 'জানবাজ', 'তেজাব', 'মিস্টার ইন্ডিয়া' বা 'সাগর' হৈহৈ করে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর তখন তো আমি পাক্কা গায়ক। রীতিমতন গড়িয়াহাট-বালিগঞ্জ পাড়ার বহুতল বাড়ীগুলিতে 'পটাং' সে সময়ে একজন সুপরিচিত কণ্ঠশিল্পী। কোনও সময়ে অলকাপুরীর রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছি হাততালি, আবার কোনও সময়ে বা দুর্গাপূজার মণ্ডপে গিয়ে গেয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি অমিত কুমার বা কিশোরের কুমারের নকল। কিশোর কুমার বা অমিত কুমারের এক একটি গান সে সময়ে আমার ঠোঁটে লেগেই থাকত। তারপরে নব্বই দশকের শুরুতেই আমার গায়ক জীবনে শুরু হয়ে গিয়েছিল কুমার শানুর দাপট। নব্বই সালের 'আশিকি', খুব সম্ভবত একনব্বইতেই 'সাজন', তারপরেই একধারসে 'দিল হ্যায় কে মানতা নেহি', 'ফুল আউর কাঁটে', 'দীওয়ানা', 'রাজু বন গয়া জেন্টেলম্যান', 'বাজিগর' থেকে নিয়ে '১৯৪২ – এ লভ স্টোরি' অবধি কুমার শানুর গাওয়া ঝঙ্কার-বিটস মার্কা, যতীন-ললিত, নাদিম-শ্রাভন, আনন্দ-মিলিন্দ বা অনু মালিকের দেওয়া সুরের সমস্ত গানই বোধহয় আমার তুলে নেওয়া ছিল। যদিও যত্নশীলতা ও উপযুক্ত অধ্যবসায়ের অভাবে গানগুলির হিন্দি পদগুলি দু-চার লাইনের বেশী জানতাম না কোনটাই। সেন্ট লরেন্সের স্কুল দ্বিতীয় ট্রিপের বাস থেকে নিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের গ্রীন বেঞ্চ পর্যন্ত, বালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর পার্শ্ববর্তী 'স্বস্তিক', ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনসের 'মীরা এপার্টমেন্ট' থেকে নিয়ে আমাদের বালিগঞ্জস্থিত বাসস্থান 'অলকাপুরী' অবধি কত যে রবীন্দ্রসঙ্গীত, কত যে শানু, কিশোর, রফি, উদিত নারায়ণ আর অমিত কুমারের গান গেয়েছি তার কোন ইয়ত্তা নেই।

তবে সমকালীন হিন্দিগানের তুলনায় কিন্তু বাংলা গানই আমার পছন্দের ছিল বেশী (এবং এখনও বাঙালী জিৎ গাঙ্গুলি, প্রীতম বা অরিজিত সিং এর জমানাতেও তাইই আছে)। আমার সর্বাধিক প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত বা অতুলপ্রসাদী গান ব্যাতীত আমার ভীষণ পছন্দের কিন্তু শ্যামাসঙ্গীত, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউলগান বা নিখাদ পল্লীগীতি। এমনকি একসময়ে বাংলার কবিগানও বেশ শুনেছিলাম বলে মনে পড়ছে। তবে বাংলা আধুনিক গান শোনার বিষয়েও আমি কোনও দিনই

কোনও প্রকারের কার্পণ্য করিনি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় যেমন শুনেছি, তেমনই মনোযোগ সহকারে শুনেছি ডক্টর ভুপেন হাজারিকা, শচীনকর্তা, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়ের গান। এছাড়াও কিশোর কুমার, লতা মঙ্গেশকার, আশা ভোঁসলে বা আর ডি বর্মণ সাহেবের বিভিন্ন গানও শুনে বেশ আনন্দ পেয়েছি আমি। তবে বেশী পুরনো দিনের বাংলা গানের গণ্ডী কিন্তু অতিক্রম করা হয়ে ওঠেনি আমার। খুব ইচ্ছে থাকলেও, আঙ্গুরবালা, কানন দেবী, দিলীপ কুমার রায়, সুধীরলাল চক্রবর্তী, জগন্ময় মিত্র, বা রবীন মজুমদারের গান আমি খুব একটা শোনার সুযোগ পাইনি। (এখন অবশ্য আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় পত্রিকায়ে কবীর সুমনের 'সুমনামি' পড়ে, এই সমস্ত গায়কের গান শোনার একটি কৌতূহল আমার বেশ জন্মেছে)।

তবে নব্বইয়ের দশকেই সুমনের গানের মধ্যে দিয়ে বা নচিকেতার জীবনমুখী সঙ্গীত এসে গিয়ে বাংলা গানের জগতে যে আমূল পরিবর্তন হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে না গিয়ে, এটুকু বলতে পারি যে আমার কনিষ্ঠ ভাইটির পাল্লায়ে পড়ে, বাড়ীতে একটা সময়ে খুব শুনেছি বাংলা রক সঙ্গীত। সত্তরের দশকের 'মহীনের ঘোড়াগুলি' শুনবার আগেই কিন্তু আমার একসময়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধু কৌশিক ব্যানার্জি বা চিরদীপ মিত্রর পাল্লায়ে পরে শুনে নিয়েছিলাম 'ক্রসউইন্ডস'। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিখ্যাত 'জ্যাভোৎসব' নামক ফেস্টে ১৯৯০ সালে প্রথমবার বিক্রমজিত ব্যানার্জি'র (টুকি'দা) গীটারের আলোড়নে আমি একেবারে অপ্রকৃতিস্থ রকমের হয়ে পড়েছিলাম বলেই মনে পড়ছে। ১৯৯৫ বা ১৯৯৬ সালের ক্রসউইন্ডসের অ্যালবাম 'পথ গেছে বেঁকে'র একটি গান (আমার ঘুম ভাঙ্গে... কখনও শান্ত মনে, কখনও ভোরের সপ্নে) তো আমি দিনে কিছু না হলেও, আমার সদ্য কেনা সোনি কোম্পানীর ওয়াকম্যানে, বারসাতেক করে শুনেছি। তারপরে আমার ভাইটি ধীরেধীরে যুবকে পরিণত হওয়ার পর বাড়ীতে সারাদিনই প্রায় দৌরাত্ম্য লেগে থাকত 'ক্যাকটাস', 'ফসিল্‌স', 'হিপ পকেট' বা 'লক্ষীছাড়া' ব্যান্ডের ছেলে মেয়েদের। লক্ষীছাড়ার লিড সিঙ্গার সায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া, আমারই ভাইয়ের দৌলতে অনেক ধরণের মাথায়ে ঝুঁটি বাঁধা, গায়ে উল্কি আঁকা, কানে বদখত দুল পড়া বা নিতান্ত চুল কামানো ও টাক মাথা বাঙালী রকস্টারকে দেখেছি আমরা।

কেবলমাত্র বাংলা রক সঙ্গীত ব্যাতীত, বাকি সমস্ত প্রকার বাংলা গানেই কিন্তু আমি ছিলাম বেশ দক্ষ। তবুও গান শুনিয়ে কোনো কিছু পাবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা বা গৌরবাকাঙ্ক্ষা আমার ছিলোনা কোনোদিনই। এবং তাঁর সাথে ধারবিহীন ইস্পাতের মতন নিজস্ব প্রয়াসও ছিল অত্যন্ত কম। সেই কারণেই বোধহয় গায়ক আমি হতে পারিনি। কার্যত চেষ্টাও করে দেখিনি কোনকালে। আর তার কারণ কেবলমাত্র আমার গান বিষয়টি সম্পর্কে অগভীর বোধশক্তিই নয়, তার সাথেই আছে উদ্যম, গানের প্রতি প্রয়োজনীয় যত্নশীলতা ও যথাযোগ্য অধ্যবসায়ের বড় বেশী অভাব। ওই দুই কি তিনবার কিছু মামুলি খ্যাতি ও প্রশস্তি পেয়ে গেলেই সবকিছুর শেষ। এখন শুনলে সকলে অবাকই হয়ে যাবেন, এতো ঘটা করে ছেলেবেলার ছন্দামাসির রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাসও করেছি মেরেকেটে মাসপাঁচেক। যেকোনো গানেই একটু সামান্য সুর মেলাতে পেরে গেলেই হয়ে যাবে আমার ছুটি। সে রবীন্দ্রসঙ্গীতই হোক বা সুমন, নচিকেতা বা কুমার শানু। একটু সামান্য স্তুতিপ্রশস্তি পেয়ে গেলেই, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় আমার যাবতীয় উদ্যমের উপসংহার। আর শুধু গানই নয়। কোনও সময়ে মনে হয়েছে সুনীলের মতন লেখক হব, কোনদিন মনে হত শক্তির মতন কবি হলে কিন্তু বেশ হত, আবার কোনদিন মনে হয় নাহ! সবার চাইতে ভালো হল গিয়ে গ্রুপ থিয়েটার। অভিনয়টাকেই বেছে নিই পেশা হিসেবে।

এই যেমন এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কৈশোরের গল্প প্রবহণ করি। ওই সময়ে নাগাদই ঝোঁক চেপেছিল থিয়েটার করবার। আমার থেকে বয়েসে বড়, দাদাস্থানীয় এক অত্যন্ত সুহৃদ দেবুদা'র প্রেরনায়ে। একসময়ে দেবুদা'র অনুপ্রেরণায় করে গিয়েছি একের পর এক থিয়েটার। আমাদেরই অলকাপুরীর পুজামণ্ডপে পিতৃবন্ধু প্রদীপকাকার নির্দেশনায়ে জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' অথবা পরম শ্রদ্ধেয় রবি জেঠুর পরিচালনায়ে 'একটি অবাস্তব গল্প' এই দুটি নাটকে দেবুদা'র অননুমেয় ও অভাবনীয় অভিনয় দেখে, যেন আমার সমস্ত আসক্তিই গিয়ে পড়েছিল থিয়েটারের উপর। পরবর্তী কালে দেবুদা'রই নির্দেশনায়ে অভিনয় করতে

সুযোগ পেয়েছি, 'গায়েন বায়েন', 'চরণদাস চোর' বা বাদল সরকারের 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটকে। 'গায়েন বায়েনের' এক একটি গান তো আমার এখনও মাঝে মধ্যেই মনে পড়ে যায়। এখনও মাঝে মাঝেই আউড়ে উঠি "মোরা শুণ্ডি রাজার সৈন্য সবাই / যুদ্ধ করি আধপেটা খাই / কাজ আমাদের হুকুম মানাই / হাল্লা রাজার নেইকো রেহাই..." তার অব্যবহিত পরেই ছিল মন্ত্রী মশাইয়ের ঠোঁট বিকৃত করে একটি অসাধারণ ছন্দময় সংলাপ, "রাজাবাবু, সোনাবাবু, না করিলে যুদ্ধু / ধনে প্রানে মারা যাবে জমিজমা শুদ্ধু / ভাইটি হঠাৎ এসে সৈন্য নিয়ে / দেকিয়ে ছাড়বে ঠিক বাপের বিয়ে / এ সময়ে হোয়োনাকো গৌতম বুদ্ধ / দেখি সোনা হও দেখি আরেকটু ক্ষুব্ধ... হেই যুদ্ধ! কিমবা ত্রিংশ শতাব্দীতে, আমার, শুভ্র, কৌশিক ও দেবুদার গলায়ে গাওয়া সেই সর্বশেষ গানখানি, "সবুজ প্রান্তর, সবুজ বনভুমি / রুক্ষ পাহাড় আর নীল আকাশ / এই পৃথিবী তুমি / সমুদ্রে লোনা জল / রূপোলী মাছের ঝাঁক / মোহময়, মধুময় পৃথিবী তুমি..."। দেবুদার পরম বন্ধু শান্তিদা বা খরাজ মুখোপাধ্যায় কথায়ে কথায়ে বলেছিলেন, ভাই তুই সত্যিকারের গ্রুপ থিয়েটারে আসিস না কেন? বেশ ভালই তো গান টান বা অভিনয় পারিস করতে। খরাজদা কি ভট্টাচার্য স্যারের মতন বুঝতে পারেননি আমি আদপে একটি ধারবিহীন ইস্পাত?

এতেই শেষ নয়। আমার চলতি ধরণের স্বাভাবিক অভিনয় ক্ষমতা দেখেই কিনা জানিনা, অফিসের স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের থিয়েটারেও ঘটনাচক্রে একরকম অপ্রত্যাশিত ভাবেই সুযোগ দিয়েছিলেন আমাদের নির্দেশক কমলকুমার ভঞ্জ। প্রথম দিকে ছোটখাটো চরিত্র পেলেও, পরের দিকে 'রাম, শ্যাম, যদু' তে শ্যাম, স্বর্ণভিলা'এ প্রদীপ্ত, এবং 'টাকার রঙ কালো'তেও বেশ বড় কিছু একটি চরিত্র পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। কলামন্দিরে মঞ্চের উপরে সরাসরি যাত্রার ঢঙে খালি গলায়ে গান শুনিয়ে নিজেরও বেশ গর্বই হয়েছিল বলে মনে পড়ছে। রিহার্সালের সময়ে মাঝে মাঝে অফিসের বন্ধুস্থানীয় সহকর্মীদের চরিত্র বর্ণনা করে পদ্যলিখন এবং তারই সাথে পাল্লা দিয়ে তিন বছর ধরে চলেছে তখন ক্লান্তিকর হিসাবশাস্ত্র, কোম্পানি আইন, ইনকাম ট্যাক্স প্রভৃতির নিয়মিত অধ্যয়ন। চার্টার্ড ইন্সটিটিউটের পরপর দুটি রবিবাসরীয় পরীক্ষায়ে পাশ করতে না দেখে, আমাকে তো আমার অফিসের এক বরিষ্ঠ সিনিয়র ম্যানেজার গোছের ভদ্রলোক সাতদিন সময় দিয়ে বেশ দৃঢ় ভাবেই বলে বসলেন, যে আমি যেন আগামী সাতদিনের মধ্যে মীমাংসা ও নিষ্পত্তি করে ফেলি যে আমি আমার জীবনে ঠিক কি করতে চাই? শানুর মতন নকলনবিশি গান, সুনীল-শক্তির মতন পদ্যরচনা, নাকি দেবুদা'র মতন থিয়েটারের অভিনয় নাকি ওই সিনিয়র ম্যানেজার ভদ্রলোকটির মতন অর্থহীন হিসাবশাস্ত্র, বোকাটে কোম্পানি আইন ও মূর্খবৎ ইনকাম ট্যাক্স? শুধু সেই সাতদিন কেন, তারপরের আজ অবধি সাত হাজার দিনেও সুনিশ্চিত করে উঠতে পারিনি ঠিক কি আমি করতে চাই...গান, নাকি পদ্য নাকি অভিনয় নাকি আমার ভগ্যে ঝুলছে কেবলমাত্র অ্যাকাউন্টেন্সি'র কচকচি?

তবে এইসমস্ত প্রবোধ বা প্রজ্ঞাহীনতা মার্কা অন্তর্মুখী কিছু ভাবনাচিন্তা মাথায়ে এলেও, আজও কিন্তু বেশ বিস্মিত হয়ে যাই যখন দেখি যে এই অগভীর প্রজ্ঞার মানুষটির কাণ্ডজ্ঞানহীন কচকচিও মানুষজন কেমন অভিনিবিষ্ট হয়ে একাগ্রচিত্তে শুনছেন। যেমনটি শুনেছেন অতীতে। তাহলে সে কি তবে শুধুই শ্রোতাটির সৌজন্যবোধ নতুবা কি অন্য কোনও পৃথক যুক্তি আছে এর পিছনে? অনেক বিবেচনা করে দেখেছি যে এর পিছনে বোধহয় রয়েছে আমার মাতুলক্রম সুত্রে প্রাপ্ত কৌতুকরসবোধখানি আর হয়ত কথার পৃষ্ঠে ক্রমাগত কথা বলে যাওয়ার গুণপনাটি। কেবলমাত্র সামান্য সূক্ষ্ম ভাবে, কৌতুকের মোড়কে, একটু গুছিয়ে নিয়ে ও কৌশলী উপায়ে কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারলেই বুঝি গাড়ী গড়গড়িয়ে চলবে। যত্নবান বাঙালী শ্রোতাকুল অতন্দ্র মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছেন ও সুদুর ভবিষ্যতেও শুনে যাবেন বলেই আমার মনে হয়। গত তিরিশ বছর ধরে যেমন শুনে আসছেন। কৌতুকরসবোধের বিষয়টি মাথায়ে এলেই, খুব বেশী করে মনে পড়ে যায় আমার বৃহত্তর মামাবাড়িটির কালীপূজোর কথা। আমার সতের আঠারো বছর বয়েস থেকে নিয়ে টানা বছর দশ বারো (অর্থাৎ শৈশব ও কৈশোরের খানিকটি সময় ব্যাতীত যতদিন কলকাতা শহরে স্থায়ীরূপে বসবাস করেছি) আমার মামাবাড়িতে অনুষ্ঠিত কালীপূজো ছিল যেন আমার সারা বছরের সেরা আকর্ষণ। আমার নিজের মা তো তাঁর তুতো

ভাইবোনেদের নিয়ে কালীপূজো নামক রসাত্মক পরিমণ্ডলটির মধ্যমনি হয়ে থাকতেনই, আর তাঁর সাথেসাথেই তুল্যমূল্য (বা বরং কিয়ত অংশে বেশী বই কম নয়) হয়ে থাকতেন আমার মায়ের কাকা ও পিসীরা (যাঁদের অনেকেই আজ কিনা স্বর্গত)। ভাঁড়ামো না করে, নিজেদেরকে নিয়েই অবিরাম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসিকতা করে চলা ও সমকক্ষ দক্ষতায়ে সেই সকল রসিকতার মর্ম উপলব্ধি করা ও তারিফ করার অসাধারণ সমবায় আমি বোধহয় কেবল আমার মামাবাড়িতেই দেখেছি।

কালীপূজোর দিনে (এবং রাতে) রসিকতা চলত প্রায় সকল জিনিস নিয়েই। প্রতিপদের দিনে দুপুরবেলায়ে ভাইফোঁটার খাওয়া খেতে বসে, কিভাবে যে ঘন্টার পর ঘন্টা তীক্ষ্ণধী মজার কথার পৃষ্ঠে আরও তীক্ষ্ণধী মজার কথা চালিয়ে যেতেন আমার মামা মাসিরা, দাদু দিদিমারা, তা এখন ভাবতে বসলে বেশ অবাকই লাগে। সন্ধ্যে বেলায়ে কালীমায়ের বিসর্জন হয়ে যাওয়ার আগে আমার মামা মাসিদের ভাইফোঁটা, আর সেই ভাইফোঁটার মন্ত্রোচ্চারন নিয়েও যে এতো রকমের রসিকতা হতে পারে, তা সে যে না শুনেছেন, তাঁরা বুঝে উঠতে পারবেননা। তবে আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, রসিকতা এমনই একটি জিনিস যেটির পিছনে আছে নানাবিধ গুণনীয়ক বা রকমারি উপাদান। ভালো রসিকতার করার ও বোঝার পিছনে আমার তো মনে হয়, ভালরকমের অবদান রয়েছে সংস্কৃতি ও পারিবারিক শিক্ষার ও সর্বোপরি মনের পরিণতির বিষয়টি। অনেক ষাটোর্ধ বা সত্তরোর্ধ মানুষজনের সঙ্গে সূক্ষ্ম রসিকতা করে দেখা গিয়েছে, তাঁদের পূর্ণ বয়স হলেও, মনটি কিন্তু রসিকতার আস্বাদন নেওয়ার জন্যে পূর্ণপরিণত হতে পারেনি। তবে আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ ও বিশ্বের নানান প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে ও চেন্নাই এবং পুনে পেরিয়ে এই মুম্বই শহরের প্রবাসে এসে ভালরকম বুঝতে পেরেছি যে রসিকতার একটি ভৌগলিক রকমফের রয়েছে। তবে একইসঙ্গে এটিও খুবই সত্যি কথা যে, সব দেশে বিদেশেই কিন্তু উৎকৃষ্ট রসিকতার কদর রয়েছে খুব। তবে কেন জানিনা, আমার ব্যাক্তিগত ভাবে মনে হয়, তাৎক্ষণিক রূপে করা একটি সূক্ষ্ম বাচনিক রসিকতা হয়ত একটি লৈখিক রসিকতার চেয়ে দুঃসাধ্য বেশী। নিজেকে বা অন্য কাউকে নিয়ে নিছক প্রহসন, সামান্য শ্লেষ বা দ্ব্যর্থক শব্দপ্রয়োগ, একটি দুটি হাসির উপমা বা অতিশয়োক্তি এই নিয়েই তো চলেছে কৌতুক, এই নিয়েই তো হেসে চলেছে সারা পৃথিবী। তবে এই কৌতুকের আলোচনায়ে নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সবথেকে অপরিহার্য গুন কিন্তু সময়জ্ঞান বা সময়নির্ধারণ। এবং এই সময়নির্ধারণ বিষয়টি খুব বেশী করে বাচনিক রসিকতায়ে রয়েছে বলেই হয়ত আমার লৈখিক রসিকতাকে সামান্য কম দুরূহ মনে হয়। এছাড়াও লেখকরা হয়ত প্রতিক্ষেপণের সুবিধা পান একটু বেশীই। তবে আমার মামাবাড়ীর রসিকতার মধ্যে যে জিনিসগুলি আমি দেখেছি, সেটির মধ্যে উল্লেখযোগ্যরূপে পেয়েছি একটু অত্যুক্তির ভাব, নিজেদেরকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি অতিরঞ্জিত আলোচনা। অস্বাভাবিক আচার আচরণ করে, অদ্ভুত দেহভঙ্গি করে অথবা কারোর নকল বা অনুকৃতি করে আমার মামা মাসি বা দাদু দিদিমারা কেউই কাউকে হাসাতে যাননি কোনকালেই। আর আমার মামাবাড়ির কৌতুকরসবোধের সাফল্য বোধহয় কতকটা সেইখানেই। তবে মামাবাড়ির রসিকতা সবার চেয়ে বেশী পছন্দ হলেও, ব্রিটিশ কমেডিয়ান সাহেবদের মতন একটু বিদ্রূপাত্মক রসিকতাও আমার ব্যাক্তিগত ভাবে বেশ ভালো লাগে।

রসিকতা, গান, অভিনয় বা পদ্য লেখার জন্যই কিনা জানিনা এবং এর আগেই কোনও একটি কিস্তিতে হয়ত বলেছি, তখন এই অধমকে দক্ষিণ কলকাতা'র ওই গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, কাঁকুলিয়া, ফার্ন রোড, গড়চা ডোভার লেনে কম করে শতকরা ষাট সত্তর ভাগ স্থানীয় ছেলেপুলে'রা এক ডাকে চিনতে পারতো। নামজাদা ও প্রথিত আড্ডাবাজ হিসেবে নামও কিনেছিলাম আর সখ্যতাও হয়ে উঠেছিল সমাজের নানাবিধ শ্রেণীর তরুণ তরুণীর সাথে। তার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল শুভ্রশেখরের বন্ধু। কিছু ছিল নিখাদ পকেটমার, ছেনতাইবাজ। শুভ্রশেখর নিজে ছিল ঘোরমদ্যপ ও পাতাখোর। প্রচুর অটোচালক ও ট্যাক্সি ড্রাইভারএর সাথেও বেশ জমাটি বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো আমার। সে খুব সম্ভবত নব্বই কি একানব্বইতেই হবে... শুভ্রশেখরের সাথে ও পরম সুহৃদ সুনন্দ'র (রাজা) সঙ্গে বেশ কয়েকবার খাস মনিপুরী গাঁজায়ে (শুভ্র অবশ্য দাবী করেছিল 'বার্মিজ') দম দেওয়ারও সুযোগও হয়েছিল

আমার। শুভ্র'র সাথে ইস্টবেঙ্গল মাঠে গেলেই তো একটি দুটি মারাত্মক টান আমার জন্যে থাকত বরাদ্দ।

সুনন্দর সঙ্গেও বার চারেক গাঁজা টেনে দেখেছি ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সে বা আয়রনসাইড রোডে ওদের বাড়ীতে রক সঙ্গীতের আসরে। গাঁজায়ে একটি দুটি টান মেরে, একটু আধ্যাত্মিক ভাব এলেই পশ্চিমী রক অ্যান্ড রোলের গীতবাদ্য, ইলেকট্রিক গীটার, কী–বোর্ড ও ড্রামসের বা পারকাসনের আওয়াজ ওই সময়ে যে এতো সুমধুর, এতো উদ্বায়ী, এতো পরিবর্তনশীল বা প্রানবন্ত শোনাতো, তা আমি এখন বলে বোঝাতে পারবনা। চোখ থাকবে বন্ধ, হাতে ধরা থাকবে একটি অদৃশ্য গীটার আর তার সাথে সাথেই চলবে রক অ্যান্ড রোল গানবাজনার অনিশ্চিত মোড়গুলির সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাথা নাড়া। 'লেড যেপেলীন', 'ডীপ পার্পল' বা 'এরোস্মিথের' মতন হার্ডরক রচনা শোনার আগে, আমি আর সুনন্দ একটু আলাপ সেরে নিতাম 'জ্যাজ', 'ব্লুস', 'ব্রিট-রক' বা 'সাইকেডেলিক' অথবা 'প্রগ্রেসিভ রক' সঙ্গীতের সাথে। এই একটু 'মাইলস ডেভিস', 'ডিজি গিলেস্পি', 'রোলিং স্টোন' বা 'চার্লি পার্কারের' স্যাক্সোফোন শুনে, একটু 'জিম মরিসন' সাহেবের 'ডোরস', 'ডায়াস্ট্রেটস' বা 'পিঙ্ক ফ্লয়েড', 'এল্ভিস প্রিস্লি', 'বিটলস' বা 'ঈগলসের' কোনও সফট রক নাড়াচাড়া করে খুলে বসতাম একটি বসু অ্যান্ড দাসের বা শুক্লা গ্রেওয়ালের অ্যাকাউন্টেন্সি'র বই। আর তারপরেই একটি দুটি হোল্ডিং কোম্পানীর অঙ্ক সেরে নিয়ে, প্রবেশ করতাম আমাদের হেভি মেটালের দুনিয়ায়ে। হেভি মেটাল ব্যাপারটি কিন্তু এসেছেই ব্লুস বা সাইকেডেলিক রক সঙ্গীতের ধারা অবলম্বন করে। তাগড়াই ড্রামস, ভারী গীটার ও পুরুষোচিত বলিষ্ঠ কন্ঠস্বরের জন্যেই আমরা হেভি মেটাল পছন্দ করতাম বেশী। বড় বেশী সতেজ ও উদ্ব্যক্ত হয়ে পড়তাম আমরা। মুলত আমরা শুনতাম, এরোস্মিথ, অসি অসবর্ণ, মেটালিকা, জুডাস প্রিস্ট ও লেড যেপেলীন। তারপরেই আবার হয়ত সিঙ্ঘানিয়া'র ইনকাম ট্যাক্স বইটি খুলেই ইতি করে দিতে হত আমাদের হেভি মেটালের আসর। তখন থেকেই, রক সঙ্গীতের ব্যাপারেও ভাসা ভাসা একটু জ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো ওই নব্বই দশকেই।

টিজে'র সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল আমেরিকার শিকাগো শহরে। ছেলেটির বয়স তখন বছর কুড়ি একুশের মতন হবে। অনেকটি যেনও আমার কনিষ্ঠ ভাইয়েরই বয়েসি ছিল সে। তার নাম ছোট করে আমিই দিয়েছিলাম টি-জে। কারণ ওঁর বড় নামখানি ছিল বেশ গম্ভীর ও অনাবশ্যক দুর্বহ। যতদুর এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, ওর নামটি বোধহয় ছিল টমসন জেফারসন মরিস বা টি-জে মরিস। ওই টমসন জেফারসন কে মার্কিনীরা ছোট করে 'টম' বলে ডাকলেও, আমি কিন্তু টি-জে বলেই চালিয়ে নিতাম। টি-জের কথা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে হেভি মেটালের প্রসঙ্গে। প্রায় সারাদিনই সেই বছর কুড়ি একুশের টি-জে 'জন বন জোভির' বা 'ফ্রেডি মার্কারী'র গল্প শোনাত আমাকে। হেভি মেটালের সঙ্গে আমার মতন একটি গেঁয়ো ভারতীয় যুবকের সামান্য পরিচয় আছে জেনে খুব আনন্দিত হয়েছিল সে। আমার কাছে বারংবার জানতে চেয়েছিল, ভারতে কোন হেভি মেটাল গায়ক সবথেকে বেশী জনপ্রিয়? 'লেড যেপেলীন' ব্যান্ডের 'রবার্ট প্লান্ট' নাকি 'জুডাস প্রিস্ট' গ্রুপের 'রব হালফোর্ড' অথবা 'গানস অ্যান্ড রোসেস'এর 'আক্সল রোস'। 'ক্রিস কর্নেলের' অমন কনকনে মার্কা হৃদয় বিদারক তীব্র স্বরেও যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হয়ে, গাড়ী চালাতে চালাতে শিকাগো মিলওয়াকির মাঝরাস্তায়ে টি-জে প্রায় দুর্ঘটনাই ঘটিয়েই ফেলে আরকি। এমনই ছিল তাঁর হেভি মেটালের প্রতি প্রেম। ব্রিটিশ রক গ্রুপ 'আয়রন মেডেন'এর 'ব্রুস ডিকিন্সন', বা 'ডীপ পার্পল' গ্রুপের 'ইয়ান গিলিয়ান' ছিল টি-জের সব থেকে প্রিয়। শিকাগো থেকে উইসকনসিন প্রদেশের মিলওয়াকি শহরে পাড়ি দেওয়ার সময়ে ওই নব্বই মাইল রাস্তায়ে আমাদের দুইজনের কথোপকথন জুড়ে শুধুই তখন কেবল হেভি মেটালের আড্ডা।

টানা তিন চার সপ্তাহ ফ্লোরিডার পাল্ম কোস্টে শহরে অতিবাহিত করে, 'ডেলটোনা', 'ডেটোনা', 'অরমন্ড' ও আরও নানানরকম ভাবে অ্যাটলান্টিক দর্শন করে ও জীবনে প্রথম বারের (ও শেষবারের) জন্যে হার্লে ডেভিডসনের মোটরসাইকেল চেপে ও চালিয়ে, রন ও লোরি'র সাথে অনেক প্রকার মার্কিনী আলাপন সেরে, মাঝে মাত্র একদিনের জন্য ফিলাডেলফিয়া এসেই আমাকে পাড়ি দিয়ে হয়েছিল শিকাগো। সেখান থেকে

আবার চলে যেতে হয়েছিল উইসকনসিন প্রদেশের মিলওয়াকি শহরে। ফিলির পেন সেন্টারের পঁচিশ তলায় আমার এইচ-আর কন্টাক্ট অ্যালেক্সা হ্যামিল যখন আমেরিকার মিড–ওয়েস্ট অঞ্চলের শিকাগো ও মিলওয়াকি শহরে যেতে হবে এমন খবরটি আমাকে শোনালেন, আমি বেশ খুশি হলেও, আমার লম্বা সিরিঙ্গে সেক্রেটারি লিন্ডা মেমসাহেব কিন্তু হয়ে পরেছিলেন বেশ অসুখী। কারণটি আর কিছুই নয়। আমেরিকার মিড–ওয়েস্ট অঞ্চলের ফেব্রুয়ারী মাসে তাপমাত্রা থাকে আঠারো ডিগ্রি ফ্যারেনহাইট থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি ফ্যারেনহাইট পর্যন্ত। অর্থাৎ কিনা মাইনাস আট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে শূন্য ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে তাপমাত্রা।

শিকাগোর ও'হেয়ার বিমানবন্দরে নেমেই, মালপত্তর নিয়ে বাইরে এসে বুঝেছিলাম শিকাগো শহরটিকে কেন 'উইন্ডি সিটি' বলা হয়। সকাল দশটা নাগাদই শনশন করে বইছে কনকনে হিমশীতল বাতাস। টি-জের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বিমানবন্দরেই। আমাকে সে বিমানবন্দর থেকেই সোজা শিকাগোর অফিসে নিয়ে গিয়েছিলো। তারপরেই দুপুরের দিকে শিকাগোর বিখ্যাত 'ডীপ ডিশ পিৎজা' খাইয়ে আমাকে পরের একদিন দুদিনের মধ্যেই সারা শিকাগো শহর ভ্রমন করিয়ে দিয়েছিল। দেখেছিলাম শিকাগোর স্টেট স্ট্রিটের শপিং মল, কিছু না হলেও সহস্রাধিক রেস্তরাঁ, শিকাগো কালচারাল সেন্টার ও পাবলিক লাইব্রেরি। তবে সবচেয়ে মজা পেয়েছিলাম সাউথ ওয়াকার ড্রাইভ পাড়ায়ে ১০৮ তলা লম্বা আমেরিকার সবচেয়ে ঊর্ধ্বকায় বিল্ডিং 'সিয়ারস টাওয়ারস' দেখে। রীতিমতন সাত ডলার খরচ করে সিয়ারস টাওয়ারসের ১০০ তলার উপরে একটি অবসারভেসন ডেক থেকে গোটা শিকাগো শহরটির স্কাইলাইনের বিস্তৃত দৃশ্য দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছিলাম। এছাড়াও মার্কিনী বাস্কেটবল লিগের 'শিকাগো বুল্সের' তাঁবুর সামনে 'মাইকেল জর্ডনের' ছবি আঁকা পতাকা দেখে আমি বোধহয় প্রথমদিনটিতে ভুলেই মেরে দিয়েছিলাম স্বামীজির কথা। পরের দিনই গাইডবুক ঘেঁটে বের করে করেছিলাম আর্ট ইন্সটিটিউট অফ শিকাগো'র ঠিকানা। অফিসের শেষে টি-জে'কে অনুরোধ করতেই দেখা গিয়েছিল শিকাগোর 'আর্ট ইন্সটিটিউট'টি গ্রান্ট পার্ক নামক একটি স্থানে, সাউথ মিশিগ্যান অ্যাভেন্যু'এর নিকটেই। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ গিয়ে সেখানে পৌঁছতে পেরেছিলাম, এটুকু মনে পড়ছে এখন। জায়গাটি বন্ধ থাকায় ঢুকতে পারিনি সেদিন সেই স্থানে, এবং সেই নিয়ে নিজেকে গালমন্দ করেছিলাম অনেক।

অতঃপর টি-জে ও আমি শিকাগো ছেড়ে যাত্রা করেছিলাম উইসকনসিন প্রদেশের মিলওয়াকি শহরে। শিকাগো থেকে মিলওয়াকি ছিল মাত্র নব্বই কি একশো মাইলের দূরত্ব। আর মিলওয়াকি শহরে তখন আমার মক্কেল বলতে ছিল একটি খুব ছোট কোম্পানী। নাম ছিল 'এ-কে রাবার'। আমাদের মুল মক্কেল 'জন্সন অ্যান্ড জন্সন' কোম্পানী কিনে নিয়েছিল ওই মিলওয়াকি শহরের 'এ কে রাবার' নামক সংস্থাটিকে। যতদুর মনে পড়ছে, মিলওয়াকির ওই সংস্থাটি ছিল চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক শল্যচিকিৎসার যন্ত্রের প্রস্তুতকারক। মাত্র তিন সপ্তাহের কাজ ও এই তিন সপ্তাহই সঙ্গে ছিল একাধারে আমার সহকর্মী ও সহযোগী ওই টি-জে। এছাড়াও ছিলেন অ্যালেক্সান্দ্রিয়া স্লুইস নাম্নী একটি মহিলা। তারও ওই বছর তিরিশেক মতন বয়স ছিল তখন। খুব মনে পড়ছে, আমাদের ভারতে 'কউন বনেগা ক্রোড়পতি'র আসল ব্রিটিশ সংস্করণ'টি ১৯৯৮ তে ইংল্যান্ডে চালু হলেও, আমেরিকায়ে প্রকাশিত হতে হতে হয়ে গিয়েছিলো ১৯৯৯ সালের অগাস্ট মাস। ওই ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী'তে আমার মিলওয়াকি শহরে থাকার সময়ে, অ্যালেক্সান্দ্রিয়া মেয়েটি কিছুই কাজের কাজ না করে সারাদিনই মেতে থাকত ওই 'হু ওয়ান্টস টু বিকাম এ মিলিয়নেয়ার' এর অনুষ্ঠানটি নিয়ে। আমিও টেলিভিসনে দেখেছি সে অনুষ্ঠান রোজই রাতে। এবং পরের দিন সকাল সকাল হোটেলে প্রাতরাশের টেবিলে মার্কিনীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আলোচনাও করেছি বলেই মনে পড়ছে। তবে এটুকু বলতে পারি, ওই 'ফিল্বিন' সাহেবের থেকে আমাদের 'অমিতাভ বচ্চন' কিছু না হলেও একশো গুনে ভালো উপস্থাপনা করিয়েছিলেন আমাদের দেশের 'কউন বনেগা ক্রোড়পতি'।

মিলওয়াকি শহরটি বেশ অদ্ভুত লেগেছিল কিন্তু আমার। চারিদিকে যখন তখন তুষারপাত হত ও মাইলের পর মাইল গাড়ী চালিয়ে গেলেও জনমানবের দেখা মেলা ছিল ভার। যে কয়েকটি জনমানবকে তাও দেখা যেত,

ফ্লোরিডা বা শিকাগোর তুলনায় সকলেই কেমন যেনও গোমড়ামুখো ও কাজপাগলা। শুক্রবার সকালেই যেমন রন অফিসে এসে বলতেন 'এইট মোর হাওয়ারস... ম্যান...''। মিলওয়াকিতে সকলে কেমন যেনও প্রয়োজনের চেয়ে বেশী গম্ভীর। প্রথম শনিবার দিনটিতে তো সারাদিনই কোথায়ে স্কিইং করতে বেড়িয়ে পড়েছিল টি-জে। আর আমি সারাদিন হোটেলের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করে ও টেলিভিশন দেখে সময় গুজরান করেছিলাম বলে মনে পড়ছে। মিলওয়াকিতে আমাদের হোটেলের নামটি ছিল 'অ্যাবে রিসোর্ট অন দ্য লেক জিনিভা'। হোটেলে ঘুরতে ঘুরতে, খুব কৌতূহল হয়েছিল আমাদের হোটেলটির নামকরণ নিয়ে। রিসোর্ট তো বুঝলাম, কিন্তু 'অন দ্য লেক জিনিভা' ব্যাপারটি মাথায়ে ঢোকেনি তখনও। মিলওয়াকির ভূগোল না বুঝে, কথায়ে কথায়ে হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে লেক জিনিভা'টি কোথায়ে প্রশ্ন করাতে তাঁরা সামান্য হেসে আমাকে একবারের জন্যে আমার হোটেলের ঘরের সংলগ্ন ঝুলবারান্দাটিতে যেতে বলেছিলেন। সেই ফেব্রুয়ারী মাসের ঠাণ্ডার দাপটে আমার ঘরের সংলগ্ন ঝুলবারান্দাটিও দেখা হয়ে ওঠেনি তখনও। পরদিন ছিল রোববার। বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল শিকাগোয়ে। সকালে ঘুম ভেঙ্গে একটু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে লাগোয়া ঝুলবারান্দাটিতে গিয়েই চমকে গেলাম আমি। দুধসাদা বরফ ও আধো গাঢ় নীল রঙের জলে সে হিমায়িত লেক জিনিভা'র এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সেই রোববারের মতন অতবড় গাঢ় নীলের মধ্যে সাদা ছিট ছিট রঙের আইসক্রিম আমি কোনদিনই দেখিনি।

সেই রোববারেই টি-জের সাথে পুনরায় বেড়াতে চলে গিয়েছিলাম শিকাগো ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ছোট ভাইটির জন্য একটি হালফ্যাশনের নাইকি জুতো কেনা ও শিকাগোর আর্ট ইন্সটিটিউটে ফের হানা দিয়ে স্বামীজির ১৮৯৩ সালের পার্লামেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নের কীর্তিটি একটু বিশদে বুঝে আসার। আর পাঁচটি আবেগপ্রিয় বাঙালীদের মতন, আমারও 'শিকাগো' নামটি শুনলেই কেন জানিনা একটু বেশী গর্ব ভরেই মনে হত, শিকাগো নামক শহরটি যেন কেবলমাত্র আমাদের স্বামীজির জন্যেই আমেরিকান সরকার প্রতিপালন করে চলেছেন। আদপে কিন্তু তা নয় একেবারেই। 'আর্ট ইন্সটিটিউট' জায়গাটি শিকাগোর মিশিগান অ্যাভেন্যু'এর উপরে একটি সুবিশাল প্রতিষ্ঠান। সে স্থানে স্বামীজির নাম দু-চার জায়গায়ে উল্লিখিত থাকলেও, ইন্সটিটিউট'টি আসলে একটি বৃহদায়তন প্রদর্শনশালা। প্রধানত আমেরিকা তথা সারা বিশ্বের অতি সুবিখ্যাত ও খ্যাতনামা শিল্পকলার এক বিপুল ভাণ্ডার। (তবে এখন শুনেছি ২০১২ সালের পর, স্বামীজির বক্তৃতার স্মৃতিতে ইন্সটিটিউট'টিতে একটি প্রস্তরফলক স্থাপন করা হয়েছে...সেও হয়ত ব্যারাক ওবামা সাহেবের ২০১০ সালে তাঁর নিজের বক্তৃতায়ে স্বামীজিকে উদ্ধৃত করার পরে!)। সমস্ত ঘটনাক্রম, এই এখন সাড়ে পনের বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর, হুবহু মনে না পড়লেও, এটুকু যথেষ্ট মনে আছে যে শিকাগোর আর্ট ইন্সটিটিউটে জীবনে প্রথমবারের জন্যে দেখেছিলাম 'রেম্ব্র্যান্ট' বা 'ভিন্সেন্ট ভ্যানগখের' প্রচুর বিরল সংগ্রহ। আমার আর্ট সংক্রান্ত শিক্ষা ও অবগতি চিরকালই ছিল বেশ কম। তবে সেই দুর্লভ শিল্পকলার সংগ্রহ দেখে নিজস্ব আগ্রহ কিছু না থাকলেও, মুহূর্তেই স্মরণে এসে গিয়েছিল আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুরমশাইয়ের কথা (একটি দুটি ই-মেইল এ, মেসোমশাই'কে সে কথা জানিয়ে ওই সময়ে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম বলে মনে পড়ছে)। এবং সেই রোববার আমি কেবলমাত্র মেসোমশাইয়ের কথা ভেবেই আর্ট ইন্সটিটিউটের একটি দুটি রেম্ব্র্যান্টের ছবির ছবিও গোপনে তুলে নিয়েছিলাম বলে মনে পড়ছে।

তবে গোটা ইন্সটিটিউট'টিতে 'পার্লামেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন' বা স্বামীজি সম্পর্কে কেউ তেমন কিছু আলোকপাত করতে পেরেছিলেন বলে মনে পড়েনা। পরে টি-জে অবশ্য অন্য কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাকে একটি 'ত্যাকো বেল' রেস্তরাঁয়ে পেটপুরে মেক্সিকান খাবার খাইয়ে, সটান নিয়ে হাজির করেছিল, শিকাগোরই উপকণ্ঠে একটি 'বেদান্ত সংগঠনে'। সেখানে সংগঠনে অবশ্য স্বামীজিকে নিয়ে অনেক বইপত্তর ও অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি দেখেছিলাম আমি। স্বামীজির গৈরিক পাগড়ি পরিহিত ছবি আমরা অনেক দেখেছি। তবে এখনও মনে আছে, সেই রোববার শিকাগোর বেদান্ত সংগঠনে, স্বামীজির তরুন বয়সের একটি পাগড়ি ছাড়া ভাসা ভাসা চাহনির একটি ছবি দেখে মুহূর্তে মনে পড়ে গিয়েছিলো আমার কনিষ্ঠ ভাইটির কথা। আমি তো একপ্রকার অবিশ্বাস্য রকমের

চমকেই উঠেছিলাম স্বামীজির সেই ছবিটি দেখে। আমেরিকার থেকেই সদ্য কেনা আশাহি পেন্ট্যাক্স কামেরায়ে ওই ছবিটির একটি ছবিও তুলে নিয়েছিলাম বলে মনে পড়ছে। অদ্ভুত কোন অজানা কারণে, ওই রোববার আমার বছর আঠারোর ভাইয়ের মুখাবয়বের সঙ্গে স্বামীজির মুখের মিল খুঁজে পেয়েছিলাম কে জানে? (কখনও মনে হয় ভাইটি সুভাষচন্দ্র বোসের মতন আদল, আবার কখনও ওর চোখ দুটি দেখেলেই স্বামীজির কথাই প্রথমে মনে পড়ে)। এইবার কখনও কলকাতায়ে গেলে পুরনো অ্যালবামগুলি ঘেঁটে দেখতে হবে সেই শিকাগোয়ে তোলা স্বামীজির ছবিটি পাওয়া যায় কিনা।

মনে পড়ছে, সেই রোববারই শিকাগো থেকে মিলওয়াকি শহরে ফেরার সময়ে বাড়ীর কথা মনে পড়েছিল খুব। ভাইয়ের জন্যে একটি সাদা - লাল রঙের নাইকি জুতো কিনে ফেলার পরেই বুঝি বোধহয় স্বদেশে ফেরার জন্য কাতর হয়ে পড়েছিলাম সামান্য। বেগুনি রঙের পন্টিইয়ক গাড়ীর মধ্যে টি-জের হেভি মেটালের অত্যাচারও তখন আমার গৃহাকুলতাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অ্যাবে হোটেলের ঘরে ঢুকে এসে, একটু একা হয়েই ঝুল বারান্দাটিতে গিয়ে একমনে গেয়ে উঠেছিলাম একটি স্বামীজিরই গান। ‘মন চল নিজ নিকেতনে... সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে...’। বাসনা হয়েছিল সমাবিষ্ট মনে ও একাগ্রচিত্তে জিনিভা লেক দর্শন করতে করতে, ওই শান্ত রোববারের সন্ধ্যেবেলায়ে পুরো গানটি কাউকে অনুকরণ না করেই, সম্পূর্ণ নিজের গলাতেই গেয়ে উঠি। কিন্তু বিধি ছিলেন বাম... ঐকান্তিকতা ও যথাযোগ্য অধ্যবসায়ের অভাবে, সে গানটিও দুর্ভাগ্যবশত আমার মুখস্থ ছিলোনা। ওই সেই মাত্র দুই তিন পঙক্তির আগে যেতে পারিনি সে রোববারেও।

ভাবছি আগামী রোববারের সকালে ঘুম ভেঙ্গে আকাশের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে একদৃষ্টে তাকিয়ে না থেকে, ধারবিহীন ইস্পাতটিতে ধার দেব প্রথমেই। গানটি শুনে নেব আরও একবার ও তার সঙ্গে গানটি উপযুক্তরূপে মুখস্থও করে নেব। এই মুম্বইয়ের প্রবাসে, স্বামীজির ওই গানটি গাইতে বড় অভিলাষ হয় মাঝে মধ্যেই, যখন খুব বেশী করে কলকাতার জন্য মন কেমন করে...

ক্রমশ... ও আগামী সংখ্যায়ে সমাপ্য...